সম্পর্ক

মলয় দাশগুপ্ত

সুরপতিকাকু আমার রক্ত সম্পর্কের কেউ ছিল না, পাড়ায় অনেকেই কাকু ডাকত, তাই আমাদেরও কাকু। কাকুদের বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ির লাগোয়া, পদবীটি খুব আনকমন ছিল, দণ্ডপাত সুরপতি দণ্ড ভাইয়েদের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠ, বড়ভাই ধনপতি আর সুরপতির সঙ্গে বয়সের তফাৎ ছিল অনেকটা, প্রায় আঠেরো বছর। মধ্যেকার অন্য পাঁচ ভাইবোন ও দণ্ড, তাই বাড়িটার নামও ছিল দণ্ডবাড়ি। এসবের মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই, এমনটা তো হয়েই থাকে। কিন্তু উল্লেখের ব্যাপার—কনিষ্ঠ সুরপতিকাকুই মারা যান প্রথমে। ধনপতি দণ্ডর ছোট ভাই সুরপতির মৃত্যু হয়েছিল ৬৩ বছর বয়সে, আকস্মিক হার্ট-স্ট্রোকে। তিনি যখন হৃদরোগে আক্রান্ত হন তখন বড় ঝুঁকি নিয়েই ট্যাক্সির সামনের সিটে চালকের পাশে বসে লাল শালু দুলিয়ে দুলিয়ে পি জি হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলুম। তখনও কলকাতার পি জি হাসপাতালে রোগী ভর্তি করা যেত, চিকিৎসাও হত। অন্তত পরবর্তীর মতো রাজনৈতিক তাঁবেদারি সুপারিশ দরকার হত না।

সুরপতিকাকুকে বাঁচানো গেল না। হাসপাতালে দু'দিন অজ্ঞান হয়ে ছিল, তৃতীয় দিনই শেষ। অন্ত্যেষ্টিতে পাড়া ঝেঁটিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সকলে। নিমতলা শ্মশান ঘাটে। যখনকার কথা বলছি, তখন এমনটাই ঘটত, সুরপতিকাকুর বড়দাদা ধনপতি জ্যেঠু আমায় ডেকে একশো টাকার একটি নোট হাতে দিয়ে বলেছিল, সুরোর ঘাটের কাজ এই দিয়ে শেষ করবে। আমি বেশ অবাক হয়েই গিয়েছিলুম। আমি তো পাশের বাড়ির ছেলে বউ কেউ না, জ্যেঠু তার নিজের ছেলেদেরও বাদ দিয়ে আমায় দায়িত্ব দিলেন কোন হিসেবে? তবে সেসব দিনে এরকম ঘটনাও ঘটত, ঘটত যে তার জ্বলন্ত উদাহরণ তো আমি শ্রীপল্লব রায় ওরফে পেলুই।

এতদিন পরে জীবনের প্রান্তসীমায় এসে এসবইবা মনে পড়ছে কেন? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায়, মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় এবং তারই যোগফল-বিয়োগফলের কারণে সমাজটা বদলাতে থাকে। এটা বিজ্ঞান, এটাই স্বতঃসিদ্ধ। পরিবর্তন ভালো দিকেও হতে পারে, পরিবর্তন খারাপ সময়ও দিতে পারে। বিচার করবে কে? ঘটনাবলীর গুণ ও অগুণই সবসময় বিচারকের ভূমিকায় থাকে। অপেক্ষা করতে হয়, তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।

সুরপতিকাকুর স্ত্রীর নাম আমাদের জানা নেই, আমরা কাকিমা বলেই জানি, কাকিমা বলেই ডাকি। কাকিমা প্রকৃতই সুন্দরী ছিলেন, পাড়ায় সুরপতির বৌ-এর সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু কাকিমা নিজের রূপ বা গুণ সম্পর্কে ঠিকঠিক অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ কোনও দিনই কেউ তাকে সাজতে দেখেনি, নিজেকে দেখানোর ইচ্ছা থেকেই সাজগোজের ব্যাপারটা আসে তার সঙ্গে সঙ্গে যা আসে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভারি স্নেহশীল ছিলেন, দু'জনের

কেউই উচ্চস্তরে কথা বলত না। আমি যে ওদের কাছ থেকে অকাতর স্নেহ পেয়েছি তা ভুলি কী উপায়ে?

নিজেদের পৈতৃক বাড়ির বাইরেটায় ছিল লাল সিমেন্ট মাজা রোয়াক। রোয়াকে বসে চা খেতে খেতে কাকুর স্ট্রোক হয়েছিল, নাকি চা-এর আগে মুড়কি জিলিপি খেতে গিয়ে গলায় আটকে চোখ উলটে পড়ে যাওয়া, তা নিয়ে মতান্তর আছে। তবে, স্ট্রোকটা ছিল খাঁটি আর গলায় মুড়কি আটকানোটাও সত্য। হৈচৈ শুনে আমরা ছুটে গিয়ে চোখ ওলটানো কাকুর একটু বাতাসের জন্য আপ্রাণ আকুলতা দেখেছি। মুড়কির বাটি উপুড় হয়ে পড়ে থাকা আর কয়েকটা কাকের সেই মুড়কি নিয়ে হুটোপুটি। সময়টা সকালবেলাই ছিল। সকালে শরীর ম্যাজম্যাজ করার লক্ষণ, গলা খাকরি দিয়ে নিত্যদিনের মতোই মুখ ধোওয়াতেও ক্লান্তি নেই। তরতাজা শোকটাই দু'দণ্ড যেতে না যেতে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে।

আগের রাতেও কোনও অন্যথা হয়নি। আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত সংসারের মতোই পুরুষরা আগে খেয়ে আগে শুতে আসার রীতি দণ্ডদেরও ছিল। কাকু সরকারি চাকরিতে বহাল হয়েছিল ব্রিটিশরাজের সময় থেকেই, সরকারি মানে রেলের চাকরি। তখন ৫৮ বছর বয়সে রিটায়ার করতে হত, রিটায়ারমেন্টের পরেও পাঁচ বছর বেঁচে ছিল সুরপতিকাকু। তবু, সে সময়ের নিরিখেও বয়সটা মরার বয়স ছিল না। ঘরকন্নার সকল কাজ সেরে কাকিমার আসতে একটু দেরিই হত। ঘরকন্নার কাজ ঘরের মেয়েরা হাতে হাতে মিলিয়েই করত, তবু গয়নার নৌকোর মতো ঢাউস একটা একান্ন সংসারের কাজ তো কম ছিল না। অন্য অন্য দিন সুরপতিকাকু ঘুমিয়েই পড়ত, এ দিন ঘুমোয়নি। কাকিমা এসে শোয়া অবস্থায় জাগ্রত দেখেছেন। কোনও কথা হয়নি, অনুরাগ বা বিরাগের কোনও বার্তাও না। কেবল কাকিমা একটা হাই তুলে নিদ্রার আভাস দিয়েছিল মাত্র। ওই হাই তোলাও কোনও ইচ্ছাকৃত ইঙ্গিত ছিল না, সারা দিনের ক্লান্তিজনিত মুদ্রাই তা।

কাকিমা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি এবং কাকুর আগে। সেই ঘুমন্ত নারীকে দেখি, নিজের স্ত্রীর নিদ্রাতুরা শিথিল তনু দেখে সুরপতির বাসনার উদ্রেক হয়েছিল কিনা তা সে ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। একবারের জন্য পুরুষ তার নিজস্ব হয়ে যাওয়া মানুষীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা হয়তো ভেবেছিল। ভাবতে ভাবতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে জর্জর পুরুষ ঘুমন্ত নারীকে সে কথা বলতে পারেনি। সুরপতিকাকু মনের ইচ্ছা মনে চেপে পাশবালিশ আঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এই ঘুমই তার শেষ ঘুম, এই অপূরণ ইচ্ছাই তার শেষ ইচ্ছা।

দুই.

সুরপতিকাকুরা নিঃসন্তান ছিল। কাকু চাকরির বেতনের পয়সা খুব হিসেব করে জমিয়েছিল যাতে তার মৃত্যুর পরে কাকিমাকে আশ্রিতা হয়ে না থাকতে হয়। বাস্তব-হিসেবি মানুষ ছিল সুরপতিকাকু। নিঃসন্তান তবে সন্তানহীন না, নিকট আত্মীয়ের মধ্য থেকেই দত্তক নিয়েছিল

জগদীশকে। দত্তক আইনি ও পাকাপোক্ত, অতএব সুরপতিকে বাবা ও তার স্ত্রীকে মা ডাকায় কোনও বাধা ছিল না জগদীশের। কেবল পড়ানো-শোনানো, খাওয়ানো-দাওয়ানোর মধ্যেই সম্পর্ক সীমিত ছিল না। স্নেহ ভালোবাসাও ছিল স্বাভাবিক সম্পর্কের মতোই। সুরপতিকাকুর মৃত্যুর পর জগদীশ সত্যিই পিতৃহীন হওয়ার দুঃখ ও অবলম্বনহীনতা বোধ করেছিল। পিতার মৃত্যুর সময়ে জগদীশ সবেমাত্র কলেজের পড়া শেষ করেছে। বৃহৎ একান্ন পরিবারে খাওয়া পরা নিয়ে প্রশ্ন উঠত না ঠিকই, তবু উচ্চশিক্ষার বদলে চাকরি খোঁজাকেই স্বস্তিদায়ক মনে করেছিল জগদীশ।

ঠিকঠাক খুঁজতে জানলে সেসব দিনে চাকরি পাওয়া যেত। জগদীশ তো বেশ কিছুটা লেখাপড়াও জানত, তাই খোঁজাখুঁজির পর বর্ধমান জেলার শিল্পাঞ্চলে একটা চাকরিও পেয়ে যায় সে। তখন এ রাজ্যে কলকারাখানার আকাল ছিল না। সূতাকল, চটকল, চা বাগিচা, খনি-খাদান, পেপার মিল, চর্মশিল্প। এসব তো ছিলই সঙ্গে সমান তালে গড়ে উঠছিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ইস্পাত শিল্প বা গাড়ি-সাইকেল তৈরির কারখানা। জগদীশ দুর্গাপুর না আসানসোল নাকি বার্নপুর কোথায় যেন চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যায়।

চাকরিতে নিয়োগপত্র পেয়ে সে আমার কাছে আসে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দেখিয়ে বলে, 'পেলুদা, বড় জ্যেঠুকে দেখানোর পর এই তোমার কাছে এলুম।'

'আমার কাছে কেন?'

'তুমি সৎ পরামর্শ দেবে, তাই।'

'তুই কী বিষয়ে পরামর্শ চাস একটু খুলে বল।'

'দ্যাখো পেলুদা, তোমার কাছে আসার আগে বড়জ্যেঠুর কাছে গিয়েছি। চাকরিটা পেয়েছি কেবল সে কথা জানাতে নয়, আমি আদৌ জয়েন করব কিনা সেকথা জানতেও। আসলে জ্যেঠুর পরামর্শ ছাড়া কোনও দিন কিছু করিনি তো। আমাদের সংসারটাও ওই একজন মানুষের মতামতে চলে।'

'জ্যেঠু সব ভেবেচিন্তে তবেই তোকে জানিয়েছে নিশ্চয়ই। তারপরে আর আমার সৎ পরামর্শের মূল্য কী। দ্যাখ জগা, আমাদের দুজনের মত এক না হলে সংকট তোরও, সংকট আমারও। তা জ্যেঠু কী বলেছে?'

জগদীশ তবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক কীসব ভাবতে থাকে, তারপর, 'পেলুদা, তোমায় আমরা 'আইডল' ভাবি, তুমি ব্যাপারটা বুঝবে, আমার মনের অবস্থাও বুঝবে।'

'আ মলো যা, অমন ধানাই পানাই করছিস কেন, খোলসা করে বল না ভাই।'

জগদীশ এতক্ষণে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। গা ছাড়া অবস্থাটা চলে গেছে, 'জ্যেঠু অনেক কথাই বললে। ওখানে জয়েন করলে যে কলকাতা ছাড়তে হবে, যৌথ পরিবারের থেকে আলাদা হতে হবে তা মনে করিয়ে দিল। আবার এও বলল, কলকাতায় বসে চাকরি

বা অন্য কোনও কাজ করতে চাও যদি—চাইতে পারো, তবে এরকম ভালো চান্স পাবে বলে মনে হয় না। এবার দেখো ভেবে কী করবে তুমি, আমার অসম্মতি নেই।'

'তা হলে তো হয়েই গেল।' বলে আমি হাত-পা ঝাড়ার মতো করে বলি।

'না পেলুদা, হয়েই গেল না, আমি ভাবছি অন্য কথা। জাহাজের মতো পরিবার ভাঙার দায়টা আমার ওপর না পড়ে।'

এবার পরিপূর্ণ ভাবে দেখি ছেলেটাকে। পুরাতন আর সাবেকের এই দ্বন্দ্ব কুড়ে খেতে শুরু করেছে জগাকে। পরামর্শ বা আলোচনাটা এজন্যই, একটা সাপোর্ট চায় ছেলেটা।

'বলি, তুই কি কাকিমাকেও নিয়ে যেতে চাস?'

'না, না, এখন সেসব কথাই উঠছে না। তাছাড়া, মা-ইবা যেতে চাইবে কেন সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে।'

'তা হলে আর সমস্যা কী? কাকিমাকে এখানে রেখে তুই গিয়ে জয়েন কর।'

'যাব?'

আমি হেসে বলি, 'আসলে তোর নিজেরই মনখারাপ করছে, খুঁতখুঁত করছে, এতদিনের পুরানো একটা শিকড় উপড়ে যাওয়ার ক্ষমতা তোর আছে কি নেই সে ব্যাপারে তুই নিশ্চিত নোস। না কি হ্যাঁ বল।'

মাথা নিচু করে পায়ের নখে মেঝেতে আঁক কষতে থাকে জগদীশ। ওর মনের দ্বন্দ্বটা বোঝাবার ভাষা এটাই। আকাশ-বাতাস-আলো মিলে যেমন জগৎ সকলকে জাপটে জড়িয়ে থাকার ওম নিয়েই মানুষের জীবন। জগদীশ তাকে শিথিল করতে চায় না।

অথচ শিথিল করতে হয়। নতুন এক জীবনের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকা যায় না। শিল্প নগরীর নতুন জীবন জগদীশকে হাত বাড়িয়ে ডেকে নেয়। প্রথমে প্রতিমাসে একদিন, পরে মাসের পরের মাসটায় জগদীশ বাড়িতে আসত। আমার সঙ্গে খুব একটা দেখা হত না। ধনপতি জ্যেঠার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে তার কাছে জগদীশের খবরাখবর পেতাম, জ্যেঠা বুকের শ্বাস চেপে দুঃখও করত। সে দুঃখের মধ্যে সত্যিই থাকত।

এমনই চলছিল। জগদীশ মাকে দেখতে আসে, একদিনের বদলে তিন-চার দিনও থাকে বাড়িতে, টাকা-পয়সা তুলে দেয় জ্যেঠুর হাতে। ছেলেটা বিগড়োয়নি বোঝা যায়। এমনই চলছিল। দিন গড়িয়ে মাস, মাস শেষ হল বছরও কাটে। বছরের পিঠে আরও বছর চাপে। এমনই এক সময়ে দণ্ড পরিবারের অভাবিতপূর্ব আঘাত নেমে আসে।

পরিবারের সেজোকর্তা রঘুপতি দণ্ডর ছোট ছেলে অনঙ্গকে পুলিস গুলি করে মেরে ফেলে। আসলে অনঙ্গকে পয়েন্ট ব্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে মারার পিছনে পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। উপদ্রুত গলির বাসিন্দা বলেই তরতাজা ছেলেটাকে প্রাণ দিতে হল। অনঙ্গর বন্ধুরা কেউ কেউ নকশালপন্থী ছিল ঠিকই কিন্তু অনঙ্গ নিজে ওই মতে

বিশ্বাসী ছিল না। পুলিস নিছক টেরর সৃষ্টির জন্যই মানুষ খুন করেছে, পুলিসের থেকে বড় টেররিস্ট আর কে হতে পারে?

অনঙ্গর মৃত্যুশোক কাটতে না কাটতেই মেজোকর্তা নৃপতি দণ্ডর লাঙ-ক্যান্সার ধরা পড়ে। এবং ধরা পড়ার ছ'মাসের মধ্যেই প্রায় নিঃস্ব করে দিয়ে মরণ তাকেও কেড়ে নেয়। এই দু'দুটো আকস্মিক ধাক্কা দণ্ড পরিবারের ভিত নাড়িয়ে দেয়। বড়বাবুর অসহায়তা পুরো পরিবারের গাঁথনিকে দুর্বল করে। এইসব দুর্ঘটনার পরেই একদিন শুনি জগদীশ তার মাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে এসেছে।

আমাদের বাড়ি আর দণ্ডদের বাড়ির মাঝ বরাবর যে পাঁচিল আছে তার দেয়ালের একটা জায়গায় ফাঁক রাখা। দরকারে ওখান দিয়ে এ বাড়ির লোক ও বাড়ি, আর ও বাড়ির লোক এ বাড়ি যাতে যাওয়া-আসা করতে পারে তার জন্য এ ব্যবস্থা। দু পরিবারের মধ্যে কোনও কারণে মনান্তর যে কখনোই হয়নি তা বলা যাবে না। কিন্তু কখনও, কোনও দিনই তা দেয়ালের ওই ফোকর বন্ধ করা পর্যন্ত গড়ায়নি। কাকিমা ওই ফোকর গলে এ পাশে আসত, আমাদের টগর ফুলের গাছ ছিল, শিউলির গাছটা তো খুবই বড়। কাকিমা এখান থেকেই পুজোর ফুল নিত, বলা যেতে পারে নিয়ে যায়। এখন শিউলির সময়। গাছের ছোট্ট ডাল ধরে নাড়া দিলেই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে শিউলি আর শিশিরের কণা। কলকাতার শহুরে কোনও অভ্যাসই এই প্রকৃতিকে বাধা দিতে পারেনি।

কয়েকদিন আগে ফুল কুড়োতে এসে, শিশিরে ভেজা হাত আঁচলে মুছে নিয়ে কাকিমা বলে, 'পেলু, তোকে আমার দু'টো কথা বলার আছে, শুনবি তো?'

'এখনই বলবে কাকিমা?'

সকালটি ছিল মনোরম এবং নির্জন। একান্তে কথা বলার উপযুক্ত সময়ই। কাকিমাও এদিক ওদিক তাকিয়ে কথা বলতে চাইল।

এমন সময় অন্দরমহলের সিঁড়ি বেয়ে আমার স্ত্রী স্নেহ নেমে এসে, 'কাকিমা, আপনিও নাকি চলে যাবেন।' বলে ছন্দপাত ঘটায়। মুখের কথা মুখে রেখেই কাকিমা জানায়, 'ঠিকই শুনেছ। জগা এবার এসেই নিয়ে যেতে চাইছে।' বলে চোখ নিচু করে মাটির দিকে তাকায় কাকিমা। চোখ ফেটে অশ্রুকণারা টুপটাপ ঝরে পড়ে শিউলি ফুলের আদলে।

বিশেষ কথা আর বলা হয় না, শোনাও হয় না।

তিন

শহরকে বেড় দিয়ে রয়েছে সমুদ্র। আর সমুদ্রতটকে ঘিরে পাহাড়। ইতিপূর্বে অনেকের মুখেই স্থানটির কথা শুনেছি, আসা হয়নি। পাহাড়ে আর সাগরে মিলে কী এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে মনশ্চক্ষে তার আদল ভেসে উঠলেও তা দৃশ্যের পূর্ণতা পায় না। তাই, ছেলে-মেয়ে দু'জনেই যখন যাতায়াতের ঝামেলার দায়িত্ব নিতে চাইল তখন আর না করা গেল

না। কয়েক দিনের অবকাশ যাপনের জন্যে বিশাখাপত্তনম। মানচিত্রে সাগরটি বে-অফ-বেঙ্গল নামেই অঙ্কিত, পৌঁছে দেখলাম চরিত্রও ওই বঙ্গোপসাগরেরই। সমুদ্র দেখাদেখি তাই খুব বিস্মিত হয় না, তবে দূর বিস্তৃত সমুদ্রের একটা সম্মোহনী আকর্ষণ তো থাকেই। তার ওপর শৈল সানুদেশের গা বেয়ে যদি বর্ষাধারা নেমে আসে তবে তো আর কথাই নেই।

সমুদ্র দর্শন সে জন্যই ব্যর্থ হয়নি। আমাদের হোটেলটি ছিল পাহাড়ের গা কেটে বসানো, এমনটায় নতুনত্ব থাকলেও অভিভূত করার মতো কিছু ছিল না। বরং কৌসানীতে গিয়ে হিমালয়ের উদার বিস্তারের আবেশের মগ্নতায় শিহরণ ছিল বেশি। এই যে নিরন্তর চলমান সমুদ্র ফণা আর ধ্যানমগ্ন হিমালয়মূর্তি এর পাশে আধুনিক জীবনকে রাখলে মানুষ কী রকম মূক না হয়ে পারে না।

হোটেলের ব্যালকনির আঁধারে আরো একজন স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে সমুদ্র দেখছে। তার মুখের সিগারেটের আগুন নিয়ম মেনে জ্বলছে নিভছে। সিগারেটের হালকা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি তার মুখ দেখতে পাই না, সেও আমাকে দেখে না। মানুষটি পাশের ঘর ভাড়া নিয়ে আছে, সম্ভবত আজ বিকেলেই এসেছে, দুপুরবেলাও ও দরজায় হোটেলের বড় তালাই ঝুলছিল। আমি ওর মুখ দেখতে পাই না, ও-ও মুখে চোখ ফেলেনি। কাছে থেকেও দূরে থাকার এই কুহেলি মানুষেই সম্ভব হয়, মানুষই বিরক্তির একতাকে উপভোগ করতে পারে।

বেলা যে বেড়েছে তা পরিপার্শ্বের শব্দাবলীর পরিবর্তন থেকে বুঝতে পারি। গত রাতে বৃষ্টি হয়েছে, হিমের আমেজ আছে তাই। ছেলে, মেয়ে আর তাদের মায়ের কথাগুলি টুকরো টুকরো আঘাত হানছে কান থেকে মনে। জানালার শার্সি গলে সূর্যের তেরচা আলো চুলের ওপর, বুঝতে পারছি। কে যেন কাকে 'হ্যালো' করে মধ্য গগনের গমগমে স্বরে গানের সুর গলায় নিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমার ছেলের কণ্ঠে শুনি, 'কাল তো এলেন, আজই চললেন?'

'বেড়াতে-এলে-ঘরে বসে—' বাক্যটির অন্তিম অংশ শোনা হয় না।

'থাক, বাবাকে ঘাটাস নে—' আমার গৃহিনীর গলা।

'তৈরি হতে বাবারই তো সময় লাগবে বেশি—' এ স্বর মেয়ের।

'থাক বুড়ো মানুষ, রেস্ট দরকার—' ছেলে আমার উদার বড়।

এইসব টুকরো কথা, এইসব ক্রমশ বেড়ে ওঠা উষ্ণতা ঘুমন্ত মস্তিষ্কের কোষে ছড়াতে ছড়াতে এক সময় বাস্তব ব্যস্ততায় এনে ফেলে। আরে আজ না হোটেল ছাড়তে হবে, আজ না সকালেই অন্য কোনখানে যাওয়ার ট্রেন। ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসি।

ছেলে, মেয়ে, বৌ সকলেই দেখছি স্নানটান করে রেডি। আমাকে জাগায়নি করুণা করে। সদ্য ঘুমভাঙা চোখে একটা আবেশ মাখানো থাকে। তাকে লক্ষ করেই সম্ভবত, 'যাও,

আবার শুয়ে পোড়ো না। স্নানটা সেরে এসো। চা আর সকালের খাবার এক্ষুনি নিয়ে আসবে, আর দেরি কোরো না।'

পাশের রুমের দরজায় চোখ পড়ে, হোটেল মালিকের বড় তালা ঝুলছে। ব্যালকনির দিকে তাকালাম, শূন্য ব্যালকনি। সমুদ্রের হাওয়া খেলছে সেখানে। চব্বিশ ঘন্টা আগেও যা ছিল এখনও তাই। মাঝখানের সময়টায় মানুষী উপস্থিতির অনুভবই বুঝি মিথ্যা।

ছেলেমেয়ের ব্যবস্থাপনায় এবার যাওয়া। ভাইজাগে এসে আরাকুভ্যালি আর আরাকু কেভ না দেখলে নাকি বেড়াতে আসার কোনও মানেই হয় না। জায়গাটা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কিছুই জানা না থাকায় পরবর্তী প্রজন্মের ইন্টারনেট ঘাঁটা জ্ঞানের উপরই ছেড়ে দিতে হয়। সূচি অনুযায়ী অতএব মাঝের একটা রাত আদিবাসী 'অধ্যুষিত' আশ্রমগৃহে থাকার ব্যবস্থা। চারিদিকে ছোটবড় পাহাড়, পাহাড়ের গা ঘেঁষা গাছপালার নিবিড় নৈকট্য, তারই মাঝে ইতস্তত ছড়ানো কট বা কটেজ। পাতলা ইটের দেয়াল, কারুকর্ম করা রঙিন টালির ছাদ। কিন্তু বিদ্যুতের আলো, পাখা সবই আছে। খাবার জায়গাটা আমাদের 'কট' থেকে কিছুটা দূরে। খাবার হল লাগোয়া উন্মুক্ত একটি মঞ্চ আছে। ওই মঞ্চে প্রতিদিনই নাকি নাচগান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আমরা যেদিন ওখানে হাজির সেদিন দশ মাইল দূরের যে জনপদ সেখানকার একটি দল নাচ-গান দেখাবে।

কট-এ পৌঁছবার পর থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় একটু গা এলিয়ে দেব ভাবছি, এমন সময় আশ্রমের লোক এক তাড়া মোমবাতি দিয়ে গেল। বিনীত ভাবে জানাল, 'লোডশেডিং নিয়মিতই হয়, ক্যান্ডেল জ্বালা তাই জরুরি। এখন রাত হয়ে গেছে, বৃষ্টিও আছে, ঘর থেকে সাবধানে বেরোবেন। আমরা কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়েছি। তবু পায়ের দিকে তাকিয়ে সাবধানে চলাই ভালো, সঙ্গে টর্চ থাকলে ব্যবহার করতে ভুলবেন না।'

সাপকে কে না ভয় পায়। শিশুবেলা থেকে বালক বয়স পর্যন্ত সাপের সঙ্গে সহবাস বলা যেতে পারে। তাই ভয়টা যেন কিঞ্চিৎ অধিকই। সাবধানকারী ভালো করতে গিয়ে খারাপ করল কেন। বাইরে বেরোব কী বেরোব না সে দ্বিধায় কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। এবং যেহেতু খাবার জায়গা খুব নিকটে নয়, খাওয়াটাও আবশ্যিক, অতএব ভয় নিয়ে ঘরে বসে থাকা যায় না। সপরিবারে প্রথমে নাচের মঞ্চ, তারপর খাবার ঘরের কাজ সেরে শয্যা গ্রহণের পরিকল্পনা।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি উপেক্ষা করেই আদিবাসীর নৃত্য চলতে থাকে তার নিজস্বতা বজায় রেখেই। সাঁওতালি নাচের মতোই সম্মেলক যূথের নৃত্যবিভঙ্গ, আদি মানবসন্তান যেদিন যূথের শক্তি আবিষ্কার করেছিল সেদিন থেকে এই দ্রিমিদ্রিমি লয়ে একই সঙ্গে, একই তালে কয়েকশো জোড়া পায়ের পদপাত। এই যূথের চর্চা, পরস্পরকে জড়িয়ে বেঁচে থাকার আর্ট আমাকে আপ্লুত করে, ভাবায়।

সকলেই যখন যৌথ নৃত্যে মশগুল তখন কানের কাছে মুখ এনে ছেলে জানায়, 'বাবা, দ্যাখো ওই ওরা সামনে।'

'কারা?'

'বিশাখাপত্তনম-এ হোটেলে যারা এক রাতের জন্য আমাদের পাশের রুমে ছিল।'

'ছিল তো কী হয়েছে?'

'না, এমনি বললাম।'

ইতিমধ্যে সামনের দু'জনই আমার ছেলেকে দেখেছে। চিনেছেও। চোখের ইশারায় কথা বলার চেষ্টা চলে দু'পক্ষেরই। চেষ্টা খুব ফলপ্রসূ হয় না। নাচ থামলে যদি আর একবার কথা বলা যায়, এমন একধরনের ইচ্ছা দু'পক্ষেরই। আমি এতে অংশ নিতে পারি না, দুই অচেনা অচেনাই থাক। আর নতুন করে আলাপ জমাবার মতো বয়স আমার অনেক আগেই বিগত হয়েছে। ওই দু'টি মানুষ সে অভিলাষ ফিরিয়ে আনতে পারবে কেন?

আমার অনুৎসাহ আমার ছেলের ভালো লাগছে না, বুঝতে পেরেও সিদ্ধান্ত বদল করতে চায় না মন। কিন্তু আমরা যা পাই, যা ভাবি জীবনে সব সময় তা কি হয়? এবারও চাওয়া-পাওয়া হওয়া-না হওয়ার হিসেব রাখতে পারি না। না রাখতে পারার মূল কারণ ওই দু'জন মানুষের অন্তরঙ্গ হওয়ার উদগ্র ইচ্ছা, বাধা দেওয়া গেল না।

দু'জনের মধ্যে বয়সে যে বড়, অনেকটাই বড়, তার মাথা জোড়া টাক, একেবারে সাদা এক জোড়া গোঁফ—সযত্নে ছাঁটা। শরীর বেশ মজবুত, চোখ দু'টি উজ্জ্বল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বয়সে অনেক ছোট বোঝা যায়, ছোট করে চুল ছাঁটা, মোটা নাক, কিন্তু ঠোঁট বেশ ছুঁচোলো, রং বেশ গৌর, জামার নিচে পৈতার আভাস স্পষ্ট।

খাবার সময়ে ওরা দু'জনে আমাদের পংক্তিতেই বসে। বয়স্কজন আমার ছেলের পাশে আর অন্যজন আমাদের কিছুটা দূর। যে যার রুচি মতো খাবার খাওয়া হয়ে গেলে বয়স্কজন আমাকে লক্ষ্যে রেখেই কথা বলে, 'আমি জগদীশ প্রসাদ আর ও বিপ্লব ঝা।' নাম পরিচয় দিয়ে জুলজুল করে চেয়ে থাকে বক্তা।

'ও আচ্ছা' এর বেশি শব্দ খরচ করি না আমি।

'আমরা দু'জনেই বর্ধমানে জামুরিয়ায় থাকি। আমি বাঙালি আর ও কিন্তু বেহারি।'

'তাই নাকি?' আমার সংক্ষিপ্ত শব্দের প্রতিক্রিয়ায় ছেলে বিরক্ত হয়, বুঝতে পেরেও পরিচয়ে উৎসাহিত হই না।

ওরা কিন্তু নাছোড়, 'ভাইজাগে আমাদের ইউনিয়নের সর্বভারতীয় কনফারেন্সে ডেলিগেট হয়ে এসেছি দু'জনেই।'

'সে তো ভালোই।' এবার বোধহয় আমার উত্তর কিছুটা ইতিবাচক শোনায়।

'আপনার শুভনাম তো জানতে পারলাম না।' বলে উৎসুক তাকায় বয়স্ক ব্যক্তি। কণ্ঠে কিঞ্চিৎ কৌতুক এসে বলে, 'আমার পুরো নামটা জগদীশ প্রসাদ দণ্ড।'

ধাক্কাটা লাগে পরে। প্রথমে কথার অবঘাত তীব্র হয়ে বাজে না। প্রায় চল্লিশ বছর, জমে থাকা স্মৃতির উপরের পলি ক্রমশ সরতে থাকে। জগদীশ নয়, প্রসাদও না ওই দণ্ড পদবিটি ভেতরটা ধরে প্রবল টান মারে। ঘোলাটে চোখে কী জলের ঝাপসা নামে? আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে থাকি, 'কলকাতার শোভাবাজার এলাকায় ছিল দণ্ডদের বাড়ি, পাশের বাড়ি রায়েদের। রায়েদের বাড়িতে একটা বারোমেসে বাতাবি লেবুর গাছ ছিল। দণ্ডবাড়ির এক ছেলে, জগা যার নাম, তার ন্যাবা রোগ হয়। সারাটা রোগের সময় রায়েদের বাতাবি লেবুই তার একমাত্র পথ্য ছিল।'

'আপনি কে?' এবার জগদীশ হতভম্ব। চিরুনি তল্লাসি চালিয়েও হদিশ পায় না সে।

দণ্ড আর রায়েদের দুটি বাড়িতেই কর্পোরেশন থেকে 'বিপজ্জনক বাড়ি' সেটে দিয়ে গিয়েছে। আসে প্রমোটার। কথাবার্তা হয়। কিন্তু নানা আইনি ফ্যাসাদ কাটাতে না পারায় দুটো বাড়িই ভূতের বাড়ি। 'আপনি কে, কে আপনি?' বিপন্ন জগদীশ।

'আমি পল্লব রায়, পেলুদা ডাকত জগদীশ নামের একটি ছেলে। পাশাপাশি দুই বাড়ির রক্তের সম্পর্কহীন দুই ব্যক্তি।

তারপর রাতে স্মৃতির ঢেউ সামলে আমরা দু'জনেই ধাতস্থ হতে পারি। শোভাবাজারের পাশাপাশি দু'টি যৌথ পরিবারই এখন টুকরো ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়া। 'বিপজ্জনক বাড়ি' তকমা নিয়ে কত সোহাগ কত যত্নে লালিত বাড়ি দুটি তাদের গায়ে সময়ের দাগ বাড়াচ্ছে।

সারারাত ঝিরঝিরে বৃষ্টির পরে ওম লাগানো সকাল।

ওরা একই সঙ্গে একটা গাড়িতে আরাকু ভ্যালিতে পৌঁছেছে। বিপ্লব ঝা আমার ছেলেমেয়ের থেকে বয়সে কিছুটা বড় হলেও এইটুকু সময়েই বন্ধু হয়ে গেছে দু'জনের। বিপ্লব যেমন আধুনিক ভাষা বোঝে তেমনই ওর ভাঁড়ারে থাকা অজস্র অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে মানুষ মাতাতে জানে। পায়ে পায়ে ওরা অনেকটা ওপরে উঠে আসে। পিছন ফিরে তাকালে ক্রমশ ছোট হয়ে আসা ইতস্তত ছড়ানো গাড়ি আর রক্ষীবাহিনীকে অন্য জগতের বলে মনে হয়। তারপর আরাকু কেভ বা আরাকু গুহা। বিপ্লব আর আমার ছেলেমেয়ে তরতর করে এগিয়ে যায় বৃহৎ প্রাচীন সে গুহায়। আমরা নারী-পুরুষে শ্লথ গতি হেতু পিছিয়ে পড়ি, পড়তে বাধ্য, জগদীশ আমাদের সঙ্গী। বাইরেটা ক্রমশ লোপ পেতে থাকে, পথ সংকীর্ণতর হয়, মাথার ওপরে ঝুলতে থাকা পাথর, কেবলই পাথরের ছাদ। কিছুদূর এগোবার পরে শ্বাসযন্ত্রের ওপর ঈষৎ চাপ বোধ হয়। প্রশস্ত এক পাথরের চাতালে বসে পড়ি আমরা।

বিস্ময়ের ঘোর আর মানবেতিহাসের বৌদ্ধিক চাপ কেমন যেন মায়া জগতের সন্ধান দেয়।

'দেখ জগা হাজার হাজার বছর আগে মানুষ এই গুহার অধীশ্বর ছিল।'

'পেলুদা, ভাবো সেদিন কোনও আলোর ব্যবস্থা ছিল না।'

'পাথরের খাঁজে খাঁজে পা ফেলে নারী-পুরুষরা এগোত। মেয়েগুলোর বুকের সঙ্গে মানবশিশু ঝুলত।'

'পেলুদা, মানুষ নিশ্চয়ই পাথরের ব্যবহার জানত। চকমকি পাথর আবিষ্কার হয়েছিল?'

'বাইরে এখনকার গবেষকরা আনুমানিক একটা সময় ফলক বসিয়েছে। তা থেকে মনে হয় চকমকির যুগ আসেনি।'

'এক হয়ে, যৌথ ভাবে থাকার সুবিধেটা বুঝতে শিখেছিল?'

'বোধহয়।'

আমার মনে হতে থাকল চারপাশের হাওয়া যেন আদি-মানুষের নিশ্বাসে ভারী হয়ে উঠছে। মস্তিষ্কের কোষ কেমন হালকা, কান পাতলে কি আদি-মানুষের স্বর শোনা যাবে?

পত্নী স্নেহকে কাছে টেনে বলি, ভাবো তো, মাথার উপরের ওই বেরিয়ে আসা পাহাড়ের পাথর এক হাতে ধরে, আর এক হাতে বুকের সন্তানটি আঁকড়ে মা দূরের ওই নিরাপদ খাঁজে যেতে চাইছে, ও কি পারবে?'

স্নেহ দু'চোখে হাতচাপা দিয়ে শিহরিত হয়ে বলে, 'আমায় ভয় দেখিও না।'

জগদীশ হঠাৎই বলে, 'আমার মা কিন্তু এখনও বেঁচে আছে, তোমার কথা বলে, পেলুদা তোমায় নাকি কী একটা কথা বলার আছে—এ জীবনে আর বলা হল না।'

'কাকিমা? কত বয়স হয়েছে, কেমন আছে সে?'

'মা-এর বয়স নব্বই বছর, এমনি ভালোই আছে, তবে কানদুটোয় তালা, একেবারে বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েছে। নইলে মোবাইলে একবার কথা বলিয়ে নেওয়া যেত।'

ফেরার পথে সবাই মিলে একটা চটিতে খাওয়া দাওয়া সারা হল। এবার যে যার নিজের পথে যাওয়ার পালা। জগদীশরা যাবে হায়দ্রাবাদ। ওখানে এক শ্রমিক ট্রাইবুন্যালের আলোচনায় ইউনিয়নের প্রতিনিধি ওরা। আমরা ফিরব কলকাতা—না শোভাবাজারের রায়বাড়ি না, সল্ট লেকের ফ্লাটবাড়িতে।